আমন্ত্রিত রচনা

শীল চিন্তার আলোকে চাম্পেয় জাতক

মৌমিতা রায়
গবেষক, সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

[**বিষয়চুম্বকঃ** বৌদ্ধ চিন্তা সমগ্র জগতে এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যা সমগ্র সমাজ তথা গোটা বিশ্বে নতুন প্রাণের স্ফুরণ তৈরী করে। আর এই চিন্তা প্রকাশিত হয় তাদের নানান সাহিত্য আলোচনা ও শিল্পচর্চার মাধ্যমে। বিপুল পরিমাণ সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম জাতক গ্রন্থ, যা সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে বৌদ্ধ নৈতিক তত্ত্বগুলিকে। তাদের গভীর দার্শনিক চিন্তা অত্যন্ত সাধারণভাবে পরিবেশিত হয় এই জাতক কাহিনীর মাধ্যমে। সাধারণত জাতক গ্রন্থে আমরা যে সকল কাহিনী পেয়ে থাকি তার মধ্যে এখানে আলোচ্য 'চাম্পেয় জাতক' কাহিনী। বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মে যে সকল কর্ম সাধন করেছিলেন বোধিসত্ত্ব রূপে, তা তুলে ধরে এই কাহিনীগুলি। বোধিসত্ত্বাবস্থায় তিনি নানা ভাবে পারমিতা ও ব্রহ্মবিহারের চর্চা করেন, যার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে বুদ্ধত্ব অর্জনের দিকে এগিয়ে যান। বোধিসত্ত্ব যে শুধু মাত্র মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন তা নয় তিনি পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যা প্রকাশ পেয়েছে চাম্পেয় জাতক কাহিনীতে। বৌদ্ধ চিন্তা পশু ও মানুষের মধ্যে যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, তা প্রকাশিত হয় জাতক কাহিনীর মাধ্যমে। এখানে কর্ম-ই মূল যা যে কোন প্রাণী সাধন করতে পারে। পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ও সেই পাশবিক হিংস্র সত্ত্বা থেকে বেরিয়ে এসে এক তপস্বীর স্নিগ্ধ রূপে প্রকাশিত বোধিসত্ত্ব। শীল চর্চায় তাঁর অদম্য উৎসাহ তা সে যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক না কেন।]

বৌদ্ধ দর্শন চর্চাতে বৌদ্ধিক স্তরে সমস্ত কিছুর ক্ষণিকত্ব, নিঃস্বভাব, পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং সেই অর্থে শূন্যতার কথা বললেও বৌদ্ধ দর্শন চর্চাতে কিন্তু মানুষ কীভাবে ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের পথে চলবে এবং সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করবে সেই রাস্তারও নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। বৌদ্ধ দর্শন যে চারটি আর্যসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল বক্তব্যই হল জগতে দুঃখের স্বীকৃতি। দুঃখ মূল সত্য হলেও দুঃখ কিন্তু এই দর্শনের শেষ কথা নয়। এই দর্শনে দুঃখ থেকে নিবৃত্তির জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্যক বাক্, কর্ম, দৃষ্টি, আজীব ইত্যাদি মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। যেখানে যেমন অন্যায় কাজ বা অন্যায় আচরণ (কায়েক, বাচিক, মানসিক - যে স্তরে -ই হোক্ না কেন) তার থেকে নিবৃত্তি যেমন বোঝায় তার সাথে সাথে শুভ গুণের - যা তাদের পরিভাষায় ব্রহ্মবিহার, পারমিতা ইত্যাদি নামে বর্ণিত , তার অনুশীলনকেও ইঙ্গিত করে। তবে এখানে আলোচনার মূল বিষয় শীল যা পারমিতার একটি বিশেষ অংশ। বৌদ্ধচিন্তা যেহেতু চিরকাল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য প্রকাশিত হয়ে এসেছে তাই পারমিতা বা ব্রহ্মবিহার ইত্যাদি শব্দের মোড়কে বেঁধে রাখলে শীল বা দান যে কোন চর্চার সাধারণ মানুষের কাছে ফুটে উঠবে না তাই সাধারণ মানুষের কাছে এগুলিকে সহজ সাধ্য রূপে পরিবেশনার জন্য এবং সেই চর্চায় তাদের অভ্যস্ত করে তোলার জন্য এই সকল 'জাতক' কাহিনী প্রকাশিত।

মূল শব্দঃ জাতক, জাতকমালা, পারমিতা, কর্ম, মৈত্রী, করুণা, শীল, নীতিতত্ত্ব,

বুদ্ধ কোন এক জন্মে যে বুদ্ধত্ব অর্জন করেননি তা নিয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আলোচনার কোন খামতি রাখেনি। আর বোধিসত্বের চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় যে, কোন ব্যক্তি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে এবং তার ব্যকুলতা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে তার কর্মের (Karmma) দিকে। অর্থাৎ সে ধীরে ধীরে আপন চিত্ত সংযম ও কর্ম, পরিবেশনার দিকে এগিয়ে চলে। এভাবেই তার সমস্ত কর্মের গ্লানি পরিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে বুদ্ধত্ব অর্জনের দিকে এগিয়ে যান।

দুঃখ মুক্তির উপায় বর্ণনার সাথে সাথে যে সকল শুভ গুণের সমষ্টিকরণের কথা প্রকাশিত হয়েছে তা ব্রহ্মবিহার ও পারমিতার মাধ্যমে বৌদ্ধচিন্তায় প্রকাশিত। এই পারমিতা হল পূর্ণতা। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব অর্জনের আগে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে সমস্ত সৎ কাজ করেছেন তাকে এক কথায় পারমিতা বলে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম অবস্তায় দশ প্রকার পারমিতা বা পারমীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাযান গ্রন্থ সমূহে ছয় প্রকার পারমীর উল্লেখ আছে। যথা - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা পারমিতা। i পারমিতার কথা বলতে গিয়ে Conze বলেছেন, The perfection of wisdom gets into name from its supreme excelence (paramitvat).ii জাতক কাহীনির মাধ্যমে পরমী-গুণ সঞ্চয়নে বোধিসত্ত্বের সুদীর্ঘকাল ব্যপী-জীবন যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এক একটি নৈতিক গুণের অধিকারী। প্রত্যেক পারমিতা এক একটি নৈতিক গুণের অধিকারী। যেমন - দান পারমিতা, এই দান অর্থে কেবল যে সাধারণ 'দান' বোঝানে হয়, তা নয়; এর অর্থ সর্বতোমুখী প্রেম ভাব। 'পরার্থ নিয়মাতাত্ননাং - অর্থাৎ প্রকৃতই অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে দান দেওয়া-ই প্রকৃত দান, সেক্ষেত্রে দাতার মানসিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দানকে প্রকৃত দান তখনই বলা যায় যখন কোন ব্যক্তি সেই দানের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখবে না। অর্থাৎ সে উদার চিত্তে দান করবে। 'শিবি জাতক' কাহিনী বোধিসত্ত্বের দানশীলতার এক অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরে। কুল্মাষাপিণ্ডী জাতক, যেখানে বোধিসত্ত্ব দানের কথা বলতে গিয়ে বলেন, দান ছাড়া কোন ধর্ম মার্গ নেই, এই দান লোক কল্যাণের জন্য, আত্মসুখের জন্য নয়। বোধিসত্ত্ব বিশ্বাস করতেন দান করার পরিণাম কখনও খারাপ হয় না।

শীল পরবর্তী পারমিতা 'ক্ষান্তি' আর এই 'ক্ষান্তির অর্থ হল - সামর্থ্য থাকলেও অপকারীর অপকার - সহন। আর এই ক্ষান্তি পালনে যথার্থ ভূমিকা পাল করেন বোধিসত্ত্ব। 'মহিষ জাতক' কাহিনী তার এক অনবদ্য নিদর্শন।

এখানে মূল আলোচ্য শীল পারমিতা। চাম্পেয় জাতকে শীল কীভাবে বোধিসত্বের আচরণে প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনার পূর্বে শীল অভ্যাস বা শীল চর্চা কী তা উল্লেখ করা অবশ্যক।

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ মুক্তির উপায় হিসাবে যে আটটি মার্গ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল - সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এরই মধ্যে সম্যক বাক, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা এই তিনটি মার্গকে বৌদ্ধ দর্শনে শীল বলে নির্দেশ করা হয়েছে। দানের সাথে সাথে শীল পালন-ও বোধিসত্ত্বের চরিত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম। এক শুদ্ধ অনবদ্য জীবনযাপনের জন্য শীল

অত্যন্ত পালনীয় কর্ম। শীলের মূল লক্ষ হল সদা সতর্ক হয়ে সপ্রজ্ঞ চিন্তায় মগ্ন থেকে লোভ, হিংসা ইত্যাদি সকল কিছুর নিরসন করে অনাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করা। শব্দগত অর্থ বোঝালে দেখা যায় শীল হল সুনীতির দ্বারা কায়িক ও মানসিক কর্মে সংযত হওয়া। এই শীল সকল প্রকার কুশল কর্মের আধার। শীলই প্রকৃত পক্ষে সমাজের মঙ্গল রক্ষা করে। এই মঙ্গলের মধ্যে যে প্রয়োজনের ভাব মিশে রয়েছে তার দ্বারাই ভালো উদ্দেশ্য সাধিত হয় ও সুখ শান্তি সুনিশ্চিত হয়। বুদ্ধ জগতের মঙ্গলের জন্য বা হিত সাধনের জন্য শীলকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কেননা যথার্থ নীতি সম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তি-ই সমাজে প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে পারে না। এই শীল পালনের দ্বারা চিত্ত মোহ মুক্ত হবে। শীল যেহেতু কায়, বাক ও কর্মের সম্পূর্ণ সংযম তাই শীলকে পবিত্র জীবনের ভিত্তির স্বরূপ বলা যেতে পারে। শীল বা সদাচার সকল প্রকার কুশল কর্মের এমনকি দুঃখ মুক্তিরূপ নির্বাণ লাভের আধার স্বরূপ।

এবার দেখা যাক শীল এর অর্থ কী? শীল পালি শব্দ 'সীল অর্থ হল সদাচার বা কায়িক ও বাচিক কর্মের পরিশুদ্ধি। সংস্কৃতে অবশ্য শীল শব্দটিও বিভিন্ন অর্থ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন শীল তিন ধরনের ক্রিয়া যথা, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম ও আজীব। আবার সম্যক বাক চার প্রকার - মৃষাবাদ বিরতি, পিশুনবাদ বিরতি, পরষুবাদ বিরতি, সংপ্রলাপ (বৃথা বাক্য) বিরতি। আবার সম্যক কর্ম চার প্রকার - অদত্তাদান বিরতি, প্রণাতিপাত বিরতি, কামসমূহে মিথ্যাচার বিরতি এবং অব্রহ্মচার বিরতি। এইভাবে সমস্ত শীলই বিরতি স্বরূপ - অর্থাৎ পাপকর্মাচারণ হইতে বিরতিই শীল। তাই কখনো কখনো বলা হয় যে সর্ব পাপের আকরণই শীল। একথা শুনলে মনে হয় তবে কী শীল শুধুই আচরণ বিরতি? না, শীল শুধু তাই নয়, ভিক্ষু কী ভাবে শীল সম্পন্ন করবেন তাতে বল হয় - 'ভিক্ষু প্রঅণাতিপাত ছাড়িয়া প্রাণাতিপাত হইতে প্রতি বিরতি হয়; নিহিত-দংভ, নিহিতি-শস্ত্র, লজ্জবান, দয়াবান এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের হিত কামনা যুক্ত হইয়া বিহার করে। উহাও তাঁহার শীল। .... পিশুনবাদ ছাড়িয়া পিশুনবাদ হইতে প্রতিবরিত হয়। লোকগণের মধ্যে বিরোধ করিতে, এদিকের কথা শুনিয়া ওদিকে বলে না, আর ওদিকের কথা শুনিয়া এদিকে বলে না। (অদিকংতু সে) বিরোধ গ্রস্ত লোকগণের মিলকারী হয়; মিলিত লোকগণকে আরও অধিক মিলনকারী হয়; সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্র-নাংদী এবং সমগ্রকরণ কথাকারী হয়। উহাও তাহার শীল। ... বৌদ্ধ শাস্ত্রে সীল দশ প্রকার, যিনি যেমন সাধক তার উপকারার্থে পঞ্চশীল, দশশীল, অষ্টশীল অনুশীলনের আদেশ আছে। পঞ্চশীল যথা- ১. প্রণী বধ করবে না, ২. পরদ্রব্য হরণ করবে না, ৩. ব্যভিচার করবে না, ৪. মিথ্যা কথা বলবে না, ৫. প্রমাদের করণে মদ্য পানাদি করবে না। অষ্টশীল যথা - পূর্ব্বোক্ত সমস্তগুলি তার উপর ৬. অপরাহ্নে ভোজন করবে না, ৭.নৃত্য, গীত, বাদ্য ও উৎসবাদি দর্শন করবে না, ৮. শোভার নিমিত্ত মাল্য বা গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করবে না, দশশীয় যথা, পূর্বোক্ত আটটি ও ৯. উচ্চাসন বা মহাসন বা মহাশয্যাতে উপবেসন বা সায়ন কব না, ১০. সুবর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করব না। আবার বিরতি ও আবিরতি, তথা চারিত্র্য ও বারিত্র্য ভেবে দ্বিবিধ শীল। প্রাণাতিপাত থেকে বিরমণ মাত্রই 'বিরতিশীল', আর চেতনাদি 'অবিরতি শীল', পটিসংভিদা'য় বলা হয়েছে, শীল কী? চেতনা শীল, চেতসিক শীল, সংবর শীল অবীতিক্রম শীল।

সুতরাং বলা যেতেই পারে শীলের সংখ্যা আট থেকে অনেক বেশী। আর তা শ্রমণদের জন্য

অবশ্য পালনীয়, যা আগে উল্লেখিত। শুধু শ্রমণ নয় গৃহীদের জন্যও শীল পালনের কথা পাওয়া যায় বৌদ্ধ দর্শন চিন্তাতে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক শ্রদ্ধালু তিনি প্রথম আটিটি এমনকি দশটি শীলও পালন করতে পারেন। গৃহস্থর পালনীয় বলে পাঁচ বা আটিটি শীল কে 'গৃহস্থশীল' বলা হয়। পঞ্চশীলকে জাতকে কুরুধর্ম বলা হয়েছে। তবে শীল সম্পন্ন হলে ব্যক্তির কী উন্নতি সম্পন্ন হবে এমন প্রশ্ন মনে আসতেই পারে আর তারই উত্তর পাওয়া যায় দীর্ঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্ত- এ যেখানে বলা হয়, ব্যক্তি শীল সম্পন্ন হলে ভিক্ষা কাম, ব্যাপদ, স্ত্যানমৃদ্ধ, ঔদ্ধত্য ও বিচিকিৎসা এই নিবারণ থেকে মুক্ত হয়। নিজেকে এমন দেখে তাদের মধ্যে প্রমদ উৎপন্ন হয়। আর প্রমদের ফলে প্রীতি উৎপন্ন হলে শরীর শান্ত হয়, আর শরীর শান্ত হলে চিত্তে সুখ অনুভব হয়, আর তখন চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হয়। আর এই একাগ্রতা ব্যক্তিকে যথার্থতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, মজঝিমনিকায়ে বলা হয় শীল পালনের ফলে গৃহীরা ধনসম্পত্তি, যশ সংসদে সাহস সজ্ঞানে মৃত্যু এবং দেবতালোকে বাস করতে পারে। ধর্মাচারী, সমাচারী গৃহস্থ ইহলোকে কিংবা পরলোকে যা জানতে, পেতে ইচ্ছা করে তাই জানতে পারে, ইচ্ছা করতে পারে। এমনকি এই জন্মেই আস্রবসমূহকে ক্ষয় করে অনাস্রব বিমুক্তি এই জনমেই লাভ করতে পারে। তবে বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক শীলকে জানতে হবে এবং শীল রক্ষা করতে হবে। শীল রক্ষিত না হলে সংসার জীবনে যেমন সুখী হওয়া যায় না, আধ্যাত্মিক সাধন মার্গেও অগ্রসর হওয়া যায় না।

জাতক কাহিনীর মধ্যে যে সকল কাহিনী বোধিসত্ত্বের এই শীল চর্চাকে তুলে ধরে, তার মধ্যে এখানে উল্লেখ্য হল চাম্পেয় জাতক কাহিনী। একটি কাহিনী কিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়কে তুলে ধরে তা দেখানোর জন্য প্রথমেই কাহিনীকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হল। উল্লেখ্য বিষয়টিকে যথাযথ ভাবে পরিবেশনা, সংজ্ঞা বা তার বর্ণনা একমাত্র নয়, উদাহরণও বিষয়কে আরও সহজ ও বোধগম্য করে তোলে যা অনুভূতিকে তৃপ্তি দেয় ও বিকাশে সহায়তা করে তাই এখানে এই আলোচনাকে উদাহরণ হিসাবে চাম্পেয় জাতক কাহিনী বেছে নেওয়া হয়েছে। তাই প্রথমেই জাতক কাহিনী বর্ণনা করা হল।

একদা অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের মধ্যবর্তী চম্পা নদী ছিল যেখানে নাগরাজ্যের রাজা নাগরাজ চাম্পেয় বাস করতেন। দুটি রাজ্যের মধ্যে নানা কারণে বিবাদ চলত। আসলে অধিকারের লড়াই,শক্তির বিস্তার এই ছিল সবসময়ের উদ্দেশ্য। একদিন মগদরাজ অঙ্গরাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেন এবং কোনক্রমে পলায়ন করে তিনি চম্পা নদী তীরে পৌছলেন। তিনি ভাবলেন, 'পরহস্তে মরণ অপেক্ষা নদীতে প্রবেশ করিয়া মরণই শ্রেয়স্কার এবং এই ভাবনার সাথে সাথে নদীগর্ভে অবতরণ করলেন। এদিকে জলের নিচে রাজ্যে নাগরাজ চাম্পেয় জলের মধ্যে রত্নমণ্ডল নির্মাণ করেছিলেন। নাগরাজ পরিবারের সাথে ব্যস্ত এমন সময় অস্ত্র সহ নাগরাজের সামনে অবতরণ করলেন মগদরাজ। এবং ধীরে ধীরে মগধরাজ নাগরাজের স্নেহাভাজন হন। কিছু কাল সেখানে থাকার পর মগধরাজ সেখান থেকে বিদায় নেন এবং নাগরাজের সহায়তায় অগরাজকে বধ করে উভয় রাজ্যের রাজা হন। নিজরাজ্যে মহাসমারোহে নাগরাজকে পূজা করতেন রাজা। এই সময় বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজপুরুষদের সাথে নদীতীরে গিয়ে নাগরাজের সম্পত্তি দেখে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে ঐ সম্পত্তি প্রার্থনা করে দান ও

শীল রক্ষা করতে লাগলেন। তবে যে দিন নাগরাজ মৃত্যু বরণ করেন তার সাতদিন পরে বোধিসত্ত্ব ঐ সকল মনঃবাসনা নিয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং নাগলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর দেহ ছিল বৃহৎ মালতী পুস্পমালার মতো। তারপর যখন তিনি নিজের চেহারা দেখলেন তখন তাঁর অনুতাপ হল। তিনি ভাবলেন যে কুশল কর্ম ও শীল পালন করেছেন তার ফল অবশ্যই সাধিত হবে। এমন জীবন সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রাণত্যাগের মনঃবাসনা করলেন। কিন্তু যকন অন্যরা তাঁর চেহারার প্রসংসা করতে লাগল তখন তাঁর এ বাসনা হারিয়ে গেল এবং তিনি সর্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে পালঙ্কে উপবিষ্ট হলেন, নাগভবন সমৃদ্ধশালী হল। এই ভাবে তিনি মহাযশস্বী হয়ে নাগভবনে রাজত্ব করতে থাকেন। এভাবে থাকার কিছুকাল পরে তাঁর মনে অনুতাপ জন্মাল। এ জীবনের তাঁর কোন প্রযোজন নেই এমন উপলব্ধি করে তিনি স্থির করলেন যে এখান থেকে মুক্ত হয়ে নরলোকে গিয়ে সত্য শিক্ষা দ্বারা দুঃখের অবসান ঘটাবেন। এবং তিনি নাগলোক ত্যাগ করে মনুষ্যলোকে এসে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর চর্ম চায় সে তা গ্রহণ করুক, যে ক্রীড়া স্পর্শ চায় সে তা গ্রহণ করুক। সে এভাবেই তাঁর সমস্ত দেহ অন্যের ভোগের জন্য উৎসর্গ করার ব্রতপালনে আগ্রহী হলেন। কিন্তু সকল লোকে তাঁকে দেখে বুঝল যে নগরাজ মহানুভব, ফলতঃ লোকে মহাসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধূপ-ধূনা দিয়ে পূজা করতে শুরু করল। এই ভাবে তিনি কিছু সময় মনুষ্যলোকে ও কিছু সময় নাগলোকে কাটাতে লাগলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন নরলোকে যদি কোন বিপদ হয় তাহলে তিনি জানবেন কী করে? তখন মহাসত্ত্ব মঙ্গল পুস্করিণীর কাছে তাঁর স্ত্রী কে নিয়ে এসে বললেন, যখন মনুষ্যলোকে কেউ তাঁকে প্রহার করবে তখন এই জল আবিল হবে আর যদি কোন সুপর্ণ তাকে গ্রহণ করে তাহলে এই জল অন্তর্হিত হবে আর কোন সুপর্ণ তাঁকে ধরে নিয়ে গেলে এই জল লোহিত বর্ণ হবে।

এই সময় বারাণসীবাসী এক ব্রহ্মকুমার তক্ষশিলায় কোন এক আচার্যের কাছে আলম্বন মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্র উচ্চারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল পদার্থের ওপর প্রভূত্ব জন্মায় তা শিক্ষা করে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে পথে মহাসত্ত্ব থাকতেন। সে ভাবল যে এই সাপটাকে নিয়ে গিয়ে সে সর্বত্র খেলা দেখাতে পারলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। সে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাসত্ত্বের কাছে গেল। মন্ত্র শুনে মহাসত্ত্বের কানে যেন তপ্তশলাকা প্রবেশ করল। তখন তাঁর মনে হল যে লোকটা যেন খড়্গ দিয়ে তাঁর মস্তিষ্ক আহত করল। তিনি লোকটাকে দেখার পর চেষ্টা করলেন এবং এটাও ভাবলেন যে তাঁর নিঃশ্বাস যদি সেই লোকটার গায়ে পড়ে তাহলে নিঃশ্বাসের বিষে সে ব্যক্তি শেষ হয়ে যাবে ও মহাসত্ত্বের শীল ভঙ্গ হবে। ফলত সে আর লোকটার দিকে তাকালো না। কিন্তু ব্যক্তিটি মন্ত্রের মাধ্যমে মহাসত্ত্বকে নানা ভাবে অত্যাচার করতে শুরু করল। সে মহাসত্ত্বের মুখে নিষ্ঠীবণ দিয়ে তাঁর বিষ দাঁত ভাঙল, মহাসত্ত্বের মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হল। এত দুঃখ পেয়েও মহাসত্ত্ব শীল ভঙ্গের ভয়ে কোন প্রতিবাদ করলেন না। ব্যক্তিটি কাপড়ের গাটের ন্যায় তার দেহ পাক দিল এবং ধোপা যেমন কাপড় পেটায় তেমনই তাকে সে পেটাল। এইভাবে সে মহাবেদনা অনুভব করেও চুপ করে রইল এবং ব্রাহ্মণের কথা মতো তার সাথে গিয়ে নানা স্থানে খেলা দেখাতে শুরু করল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় মহাসত্ত্ব কোন আহার গ্রহণ করতেন না। একদিন সেই

ব্যক্তি বারাণসীতে উপস্থিত হলেন সাপ খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বোধিসত্ত্ব তাঁর নৃত্যের মাধ্যমে মহারাজ ও আমাত্যদের মন জয় করলেন। এদিকে তাঁর স্ত্রী সুমনা তাঁর জন্য নাগলোকে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং মঙ্গলু পুস্করিণীর জল লোহিত বর্ণ দেখে চিহ্নিত হলেন। এবং রাজসভাতে মহাসত্ত্ব তা অনুভব করে মনে মনে অনুতপ্ত হলেন। মহারাজ মহাসত্ত্বের কাছে তার অনুতপ্ত মনোভাবের কারণ জানতে চাইলেন এবং মহাসত্ত্ব বিস্তারিত বললেন। তখন রাজা তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে নাগলোকে পাঠালেন। এবং নাগলোকে গিয়ে মহাসত্ত্ব অর্থাৎ নাগরাজ চাম্পেয় বসবাস করতে লাগলেন মহা সম্মানের সাথে।

এ ছিল বোধিসত্তেবর পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ কালের একটি কাহিনী। তবে কেন এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত করা হল বা এই কাহিনী মূল আলোচনায় কতটা প্রাসঙ্গিক তা দেখা যাক্।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যা-ই হোক্ না কেন বা এতে নাটকীয় বা গল্পের নানা সামগ্রী থাকলেও যে দুটি মূল দিক এখানে ফুটে উঠেছে তা হল - প্রথমতঃ শীল চর্চা, দ্বিতীয়তঃ বোধিসত্ত্বের পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ। এখন বিষয়টিকে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্।

প্রথমত বোধিসত্ত্বের শীল চর্চার একটি কঠিন চিত্র এখানে প্রকাশিত। মহাসত্ত্ব কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের শীল চর্চা থেকে বেরিয়ে আসেননি। আমরা দেখেছি যকন সাপুরে তাকে নানা ভাবে অত্যাচার করেছে তখন ও তিনি প্রতিবাদ হীন নীবর - তিনি শীল পালন করে চলেছেন অবিরত। এখানে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় তিনি শীল চর্চার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন - আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন;

ইধ অবিসাবকো আত্তনো সীলনি অনুসস্রতি। শীল সকলে কী বলে অনুসরণ করেন? অখন্ড, আচ্ছুদানি, অসবলানি, অকস্মাখানি, ভুজিস্সানি, বঞ্ঞপ্পসমস্থানি, অপরামট্ঠানি, সমাদিসংবত্তনিকানি। অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয়নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয়নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোন স্বার্থ সাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে - এই ভাবে শীলের গুণ বারে বারে স্মরণ করবে।

এখানে বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ চাম্পেয় রাজ নিয়ে যখন উপলব্ধি করলেন ঐশ্বর্যতে তাঁর শান্তি নেই তখন তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করেন শীল চর্চার জন্য এবং সেই সময়ে তিনি নানাভাবে অত্যাচারিত হলেও শীল চর্চায় রত ছিলেন। এবং প্রত্যেক সময় তিনি শীলগুলি স্মরণ করেন এবং কোনভাবেও তাঁর শীল চর্চাতে যেন কোন অঘাত না আসে তার চেষ্টা করেছেন - অর্থাৎ শীলে কোন ছিদ্র না হয় - এবং তাঁর চর্চা থেকে এটা যথেষ্ঠভাবে প্রমাণিত যে তিনি তা কোনভাবেই জোর করে সাধন করেননি, মনের গভীরে উপলব্ধির স্তরে ছিল তাঁর চর্চা।

এছাড়াও বলা হয় যে মনে ক্রোধ, দ্বেয়, লোভ, ঈর্ষা থাকলে সে সৎ হতে পারে না আর এই ভাবনা দূর হয় শীল সাধনের মাধ্যমে। আর ঠিক এই বিষয়টি আমরা পেয়ে যাব দ্বিতীয় অংশে - অর্থাৎ

পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি কিভাবে তাঁর কর্মে রত ছিলেন। তিনি সর্প রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সর্পের কোন হিংসাত্বক গুণের প্রকাশ পায়নি তাঁর চরিত্রে, বরং উল্টোটাই প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর নিশ্বাসের বিষে যাতে ব্যক্তির ক্ষতি না হয় তা তাঁর স্মরণে ছিল এবং তা তিনি পালন করেছেন। কেনা এমন যদি কোন কার্য ঘটত তবে তাঁর শীল ভঙ্গ হত। ঐশ্বর্যের প্রতি কোন লোভ তাঁর ছিল না, তাঁকে অত্যাচার করলেও তাঁর মধ্যে কোন ক্রোধের জাগরণ হয়নি - এই সবই ছিল তাঁর শীল চর্চার ফল।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার বিচারের বলা যেতে পারে বোধিসত্ত্ব যে কোন অবস্থাতেই বা যে কোন রূপেই তাঁর মূল ধর্ম থেকে কখনও সরে আসেননি। এ ছিল তাঁর কঠিন তপস্যা। দীর্ঘ তপস্যার পরে যে তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁর সেই তপস্যা সাধারণকে ছাড়িয়ে অসাধারণের দিকে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ক্রমাগত - তার ই প্রকাশ এই জাতক কাহিনী।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

- Cowell, E.B., 1973. The Jataka or storie of the Buddha's Former Births. 6 vols, Delhi: Cosmo Publicati
- Law, B.C., 1974. The History of Ppali Literature. 2 Vols, Varanasi Bharatiya Publishing House.
- Speyer, J.S., (trns.), 1982. The Jatakamala. Delhi: Motilal Publishing House.
- Harvey, P., 2000. An Introduction to Buddhist Ethics Foundation, Values and Issuess. USA Cambridge Press.
- Swami Hariharananda Aranya (ed.), 2005. Bodhicharavatara. Kolkata : Mahabodhi Book Agency.
- Har Dayal., 1970. The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Publication.
- Misra, G.S.P., 1984. Development of Buddhist Ethics. Delhi : Munshiram Manoharlal Publication.
- Sarkar, S.C., 1981. A Study on The Jatakas and The Avadanas. Calcutta: Saraswat Library.
- চট্টোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন., (সম্পাদিত), ২০১২ ।প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম, কলকাতা, করুণা প্রকাশনা।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র., ১৩৫৯ মাঘ, বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
- ঘোষ ঈশানচন্দ্র., ১৪১৯ সন. জাতক. কলকাতা, করুণা প্রখঅশনা।
- ঘোষ ঈশানচন্দ্র., ২০০৮. জাতকমঞ্জরী, কলকাতা, করুণা প্রকাশনা।
- ধর্মপাল মহাথেরো., ১৯৯৩. জাতকনিদান (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলকাতা ঃ বৌদ্ধধর্মাঙ্কর বিহার।
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ., ১৩৬৩ সন. বুদ্ধদেব, বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

- চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদনা)., ১৪০৪ সন, গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতাঃ মহাবোধি।
- ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদনা)., ২০০৭, বৌদ্ধকোষ (ষষ্ঠ খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ., ১৯৪১. বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, কলিকাতাঃ আনন্দ প্রকাশনা।
- গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ., ১৯৭৫. শিল্পে ভারত ও বর্হিভারত, কলিকাতাঃ আনন্দ প্রকাশন।
- স্বামী হরিহরানন্দ (সম্পাদনা)., ২০০৫, বোধিচর্য্যাবতার, কলিকাতাঃ মহাবোধি।
- সাধনকমল চৌধুরী (সম্পাদনা)., ২০০২, বিশুদ্ধ দীঘনিকায়, করুণা প্রকাশনা, কলকাতা।
- ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাদনা)., ১৯৯৯, ধম্মপদ, কলকাতা।

[i] বৌদ্ধকোষ, ষষ্ঠকণ্ড, পৃ-৭৬২

[ii] Ast. pr., ed, Conze, p.31

[iii] দীর্ঘনিকায় ২ খং, ৪৯ পৃ, ধম্মপদ ১৮৩

[iv] দীঘনিকায় সানঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১খং, ৬২ ৩ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য - ঐ ব্রহ্মজাল সূত্ত (১) ১খং; মজ্ঝিমনি, চূলহতথিপদোপমসুত্ত (২৭); মহাতণহাসংখয়সূত্ত (৩৮); সালেয্যসূত্ত (৪৯)

[v] পটিসংভিদামগণ্ (১খং ৪৪পৃ)

[vi] কুরুধর্মজাতক

[vii] বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ২০-২১